নারীত্বের বহু সমস্যার মূলেই ফাইব্রয়েড

মেয়েদের শরীরে মাতৃত্ব ধারণের শত্রু, ফাইব্রয়েড-এর ভূমিকা খুবই উলে খযোগ্য। এই রকমই একটি সমস্যা নিয়ে আমার চেম্বারে এসেছিলেন শাশুড়ি অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও তার বউমা মিতালি। সমস্যা - বারবার মিসক্যারেজ। মিতালির জরায়ুর ভিতরে বেশ কয়েকটি ফাইব্রয়েড আছে। মিতালির জরায়ুর অন্ড়ঃত্বকে ফাইব্রয়েড থাকার জন্যেই বারবার গর্ভ পাত হয়ে যাচ্ছে। যদিও শাশুড়ির ধারণা ছিল, "একটু বেশি বয়সে মা হতে চাইছে বউমা, তার ওপর চাকুরিজীবী হওয়ার দৌড়ঝাঁপ করায় হয়তো বারবার মিসক্যারেজ হয়ে যাচ্ছে"। মিতালি ও তার শাশুড়িকে আমি যে দু'টি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলাম তা হল-

১) ফাইব্রয়েড এক ধরণের টিউমার। কিন্তু এই টিউমার থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা এক শতাংশেরও কম।

২) অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশন না করেই চিকিৎসা করা সম্ভব এবং সন্ড়ান নেওয়ার আগে অপারেশন না করে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেই হবে। জরায়ুতে ছুরি কাঁচি চালানোর আগে হরমোন থেরাপি বা অন্য ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসা করিয়ে নেওয়া গর্ভবতী মা ও সন্ড়ান উভয়ের পক্ষে নিরাপদ এবং মঙ্গলজনক। তবে সন্ড়ান প্রসবের পর ফাইব্রয়েড সারিয়ে ফেলতে হবে।

dvBe‡qW wK Ges †Kv_vq nq?

বাইব্রয়েড হল নারীদেহের অত্যন্ড় কমন টিউমার। নীরবে ও সন্ড়র্পণে বিভিন্ন আকৃতিতে এই ফাইব্রয়েড বেড়ে ওঠে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি পাঁচজন মহিলার মধ্যে অন্ড়ত একজনের শরীরে এই অসুস্ড়তা দেখা যায়। শতাংশের বিচারে ২৫ শতাংশ মহিলার দেহে ফাইব্রয়েড থাকতে পারে। পনেরো-ষোল বছর বয়স থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর বয়সি যে কোন মহিলার দেহে ফাইব্রয়েড হতে পারে। তবে ২০ বছরের কম বয়সি মেয়েদের দেহে এর উপস্থিতি কম। ৩০-৪০ বছর বয়সিদের মধ্যেই ফাইব্রয়েডে আক্রান্ড়ের হার বেশি। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ফাইব্রয়েডগুলি এক মিলিমিটার হতে পারে। ওজনের দিক থেকে ১ থেকে ১০ কেজি পর্যন্ড় হতে পারে। মাঝে মধ্যেই ডাক্তাররা মহিলাদের জরায়ু থেকে ফুটবলের আকৃতির ফাইব্রয়েড টিউমার অপারেশন করে বের করে থাকেন।

‡Kv_vq Ges †Kb dvBe‡qW nq?

মূলত মহিলার জরায়ুতে ফাইব্রয়েড হয়ে থাকে। তবে জরায়ুর পেশিতে ও অন্ড়ঃত্বকে অনেক সময় ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখে, ব্রড লিগামেন্ট ও ডিম্বাশয়ের পাশেও ফাইব্রয়েড সৃষ্টি হতে পারে। শতকরা ২০-৫০ শতাংশ মহিলার দেহে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু কেন শরীরের অভ্যন্ড়রীণ একাধিক অঙ্গে এই ফাইব্রয়েড সৃষ্টি হয় তার প্রকৃত কারণ এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি। অনুমান করা হয়, যৌনবতী মহিলাদের দেহে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণের সঙ্গে এই ফাইব্রয়েড সৃষ্টির কোন সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, নারীর দেহে যখন ইস্ট্রোজেন সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষরণ হয় সেই সময়, অর্থাৎ ২৫-৪০ বছর বয়সে ফাইব্রয়েড তৈরি হয়। আবার মেনোপজ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফাইব্রয়েডের বৃদ্ধি থেমে যায়। মহিলারা কি করে বুঝবেন?

একটু গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করলেই যে কোন মহিলা বুঝতে পারবেন তার শরীরে নীরবে এই মারাত্মক শত্রু হানা দিয়েছে। শরীরে এই অসুস্থতা সৃষ্টি হলেই মহিলারা দেহে কতগুলি লক্ষণ ফুটে ওঠে। আবার অনেক সময় মহিলাদের শরীরে এই অস্বাভাবিক অসুস্থতা নীরবে থাকায় রোগী বুঝতেই পারেন না। লক্ষণগুলি হল-

ক) ঋতুকালীন সময়ে অতিরিক্ত রক্তস্রাব।

খ) নির্দিষ্ট সময় অন্ড়র মাসে একবারের পরিবর্তে দশ-পনেরো দিন পর পর হঠাৎ হঠাৎ করেই রক্তস্রাব।

গ) তলপেটে ভারী কিছু থাকার অনুভূতি।

ঘ) ঋতুস্রাবের সঙ্গে পেটে অস্বাভাবিক ব্যথা।

© DR. SHAHJADA SELIM

wK wK ¶wZ nq?

মহিলাদের স্বাভাবিক মা হওয়ার পথে ফাইব্রয়েড অনেকটাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কখনও কখনও কোথায় ফাইব্রয়েড হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে অসুস্থতা। এগুলি হল-

ক) সবসময় শরীরে একটা অস্বস্থির অনুভব হয়।

খ) জরায়ুর অন্ড়:ত্বকে হলে অকাল গর্ভপাত হয়।

গ) জরায়ুর ভিতরে হলে রক্তস্রাবে সমস্যা হয়।

ঘ) জরায়ুর মাংসপেশিতে হলে ঋতুকালীন সময়ে পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয়।

ঙ) কোষ্ঠকাঠিন্য ও রক্ত স্বল্পতা (অ্যানিমিয়া)।

চ) স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব, সাময়িক বন্ধ্যাত্বও হতে পারে।

ছ) অনেকের ক্ষেত্রে মূত্রথলিতে সংক্রমণও হয়।

dvBe‡qW n‡j wPwKrmv wK n‡e?

অনেক মহিলার শরীরে ফাইব্রয়েড থাকলেও সারাজীবন তেমন কোন সমস্যা অনুভূত না হওয়ায় চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয় না। আবার অনেকে এক বা দু'টি সন্ড়ান জন্মের পর এই সমস্যায় ভোগেন বলে খুব একটা গুরুত্ব দেন না।

কোন বয়সে বা কি অবস্থায় আছেন রোগী তার ওপরেই চিকিৎসার বিষয়টি নির্ভর করে। কারণ, চিকিৎসার তিনটি পদ্ধতি আছে।

ক) কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট - এই ধারায় কোনরকম চিকিৎসা না করে ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে পরিস্থিতির সামাল দেওয়া। এবং মেনোপজ পর্যন্ড় অপেক্ষা করা। তবে এই সময় নষ্ট করলে ভবিষ্যতে অন্য অসুস্থতা হতে পারে।

খ) মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট - বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখিয়ে তাদের পরামর্শ মেনে ওষুধ ও ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা। প্রয়োজনে হরমোন থেরাপি দিয়ে ফাইব্রয়েড শুকিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে যারা মা হতে চান তাদের জন্য এই চিকিৎসা-ধারা অনেক বেশি পজিটিভ।

গ) সার্জিকেল ম্যানেজমেন্ট - অপারেশন করে ফাইব্রয়েড জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের গায়ে যেখানেই হোক তা সরিয়ে দেওয়া। এই ধারার তিনটি মুখ্য পদ্ধতি আছে -

প্রথম পদ্ধতি - মায়োমেক্টমি অর্থাৎ ফাইব্রয়েড নামের টিউমারটি পুরোপুরি বাদ দেওয়া। এই বাদ দেওয়ার পদ্ধতিটিও তিন ধরনের।

(১) ল্যাপারোস্কোপি - এই অপারেশনে রোগীর পেটে শুধুমাত্র দু'টি বা তিনটি ছোট করে গোটা অপারেশনটি করা হয়। রক্তপাত ও যন্ত্রণা কম, চটজলদি কাজে ফিরতে পারেন মহিলারা।

(২) হিস্টেরোস্কোপি - জরায়ুতে হিস্টেরোস্কোপ যন্ত্রের ক্যামেরা ঢুকিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়।

(৩) ল্যাপারোটমি - এটি এক ধরনের ওপেন সার্জারি। সরাসরি পেট কেটেই ফাইব্রয়েড বাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি - এম্বোলাইজেশন, এই ধারায় ফাইব্রয়েডে রক্ত সরবরাহকারী সমস্ড় ধমনীগুলি বন্ধ করে দিলে তা আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। যেহেতু কাঁটাছেড়া করার প্রশ্ন নেই, তাই এই পদ্ধতিটি অনেক বেশি নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন।

© DR. SHAHJADA SELIM

তৃতীয় পদ্ধতি - হিস্টেরেকটোমি, এই পদ্ধতিতে টিউমার অর্থাৎ ফাইব্রয়েডসহ গোটা জরায়ুটি অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়। মূলত যারা মা হয়ে গিয়েছেন অর্থাৎ আর সন্তান নেওয়ার প্রশ্ন নেই, তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়।

© DR. SHAHJADA SELIM